বাংলাদেশের যাত্রাগানে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থাপন

তপন বাগচী

যাত্রাগান বাঙালির প্রাচীন বিনোদন-মাধ্যম। দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে যাত্রা-নাট কিংবা নাটগীত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃষ্ণলীলার অভিনয়কে যাত্রাগান মনে করার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। যাত্রার জন্ম নিয়ে সকল অভিমতকে আমলে নিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, উৎসব-অর্থে যাত্রার উন্মেষ প্রাচীনকালে, কিন্তু অভিনয়কলা-অর্থে যাত্রার উন্মেষ ষোড়শ শতকে, গ্রামীণ আসরে বা চাতালে। অষ্টাদশ শতকে যাত্রা চাতাল বা আসর থেকে উঠে আসে বাঁধামঞ্চে। অষ্টাদশ শতকের পর থেকে যাত্রা উৎসব কিংবা গীতাভিনয়ের আবরণ ঝেড়ে পরিণত হয় স্বতন্ত্র এক অভিনয়কলায়।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশেই যাত্রার চলন, বিকাশ এবং প্রবাহ। আমরা জানি, যাত্রার জন্ম এই সমতটে। অর্থাৎ আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডেই যাত্রার জন্ম। যাত্রা বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। যাত্রা শুরুতে ছিল দেববন্দনার অংশ, কালে তা পৌরাণিক উপাখ্যান বয়ানের মাধ্যমে লোকশিক্ষার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। চারণকবি মুকুন্দদাসের হাতে যাত্রা তার বিষয় ও উপস্থাপনার গুণে রূপান্তরিত হলো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ারে। মুকুন্দদাস যাত্রায় মাতৃপ্রতীকে দেশবন্দনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পালা 'মাতৃপূজা'য় মায়ের প্রতীকে দেশের কথা বলেছেন। যাত্রায় নারীর অবস্থান ও উপস্থাপন রয়েছে নানানভাবে, নানান রূপে। যাত্রায় নারীর জয়গান রয়েছে, নারী-পুরুষ সমতার কথা রয়েছে।

যাত্রায় নারীর অগ্রযাত্রা

যাত্রাগানের শুরু থেকেই নারী-পুরুষ চরিত্রের সম্মিলিত অভিনয়ের সুযোগ রয়েছে। আদিতে কৃষ্ণলীলা পালাই ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয়। কৃষ্ণলীলা মানেই রাধা-কৃষ্ণের লীলা। সঙ্গে অষ্টসখী কিংবা ষোলশ' গোপিনী তো রয়েছেই। কৃষ্ণলীলা পালায় পাত্রপাত্রীর নাম উচ্চারিত হলেও আগে নারীচরিত্রের কথাই আসে। বলা হয় 'রাধাকৃষ্ণ', কখনোই 'কৃষ্ণরাধা' বলা হয় না। এই পালায় রাধাই কেন্দ্রীয় চরিত্র। কৃষ্ণলীলার মধ্যে 'রাধার মানভঞ্জন', 'রাইউন্মাদিনী' কিংবা 'নৌকাবিলাস' পালাই বেশি জনপ্রিয়, যেখানে রাধার ভূমিকাই মুখ্য। তবে মজার ব্যাপার হলো, বিশ শতকের আগে যাত্রাপালায় নারীচরিত্রে রূপদান করতেন পুরুষ-অভিনেতারাই। নারীর অংশগ্রহণ সেখানে ছিল কেবলই দর্শকরূপে। এই ধারা চলতে থাকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত। তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলায় বর্তমান ঝালকাঠিতে 'লেডি কোম্পানি' নামের একটি যাত্রাদল গঠিত হয়। এটি নারী পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল। এর অধিকারী ছিলেন শ্রীমতী বোঁচা নামের এক নারী। নারীশিল্পীর অংশগ্রহণও শুরু হয় এই দলের মাধ্যমেই।

'লেডি কোম্পানি'তে প্রথম নারীশিল্পী অংশ নিলেও ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'জয়দুর্গা অপেরা'র নৃত্যশিল্পী জ্যোৎস্নারানী দত্ত'র মাধ্যমে এই ধারা বিস্তার লাভ করে। কৌতুকাভিনেতা সূর্য দত্ত ছিলেন তাঁর পিতা। সূর্য দত্তের আরো তিন মেয়ে মায়ারানী দত্ত, ছায়ারানী দত্ত, দয়ারানী দত্ত এবং তিন ছেলে ননী দত্ত, গোপাল দত্ত ও দুলাল দত্ত— সকলেই ছিলেন যাত্রাজগতের বাসিন্দা। সূর্য দত্তের গোটা পরিবারই ছিল যাত্রাশিল্পে নিবেদিত। প্রথমে তাঁর মেয়েরা নাচতেন, পরে সকলেই চরিত্রাভিনয়ে সুনাম অর্জন করেন।

১৯৫৮ সালে গঠিত 'বাবুল অপেরা'র অধিকারী ছিলেন চট্টগ্রামের আমিন শরীফ চৌধুরী। এটি মূলত 'বাবুল থিয়েটারে'র যাত্রা-রূপান্তর। প্রখ্যাত নট অমলেন্দু বিশ্বাস ছাড়াও এই দলের শুরুতে শিল্পী হিসেবে ছিলেন সাদেক আলী, নাজির আহমেদ, সাধনা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী মুখার্জী, বেণী চক্রবর্তী, ঊষা দাশ, মকবুল আহমেদ, এমএ হামিদ, জাহানারা বেগম, শান্তি দেবী প্রমুখ। জাহানারা বেগম এদেশের প্রথম মুসলিম নারী যাত্রাশিল্পী। অমলেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন যে, 'বাবুল অপেরা এদেশে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে যাত্রাভিনয় প্রথার প্রচলন করে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন'। এই সাহসী নারীশিল্পী মঞ্জুশ্রী মুখার্জীর জন্ম চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের বাবুল থিয়েটারে ১৯৫০ সাল থেকে অভিনয় শুরু করেন। 'বাবুল থিয়েটার' ১৯৫৪ সালে 'বাবুল অপেরা' নামে

রূপান্তরিত হলে মঞ্জুশ্রী মুখার্জী এই দলের নায়িকা হন। এর আগে কোনো নারী নায়িকা-চরিত্রে অভিনয় করেন নি। বাবুল অপেরাই প্রথম নারী-পুরুষ সম্মিলিত যাত্রাদল। নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সম্পর্কে বলেছেন, 'এই টানা চৌত্রিশ বছর নৃত্যগীতপটীয়সী যাত্রানায়িকা মঞ্জুশ্রী মুখার্জী চট্টগ্রামের ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদল বাবুল অপেরার যাত্রামঞ্চে এদেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রারসিকদের মন বিচিত্র নাট্যভাবনার রঙে-রসে আপ্লুত করেছেন'।

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান' বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য দল হিসেবে পরিগণিত হয়। সিরাজগঞ্জের নারায়ণচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই দলের অধিকারী। ১৯৬০ সাল থেকে এই দলে নারীশিল্পীরা অভিনয় করতে শুরু করেন। বাবুল অপেরার পরে নারীশিল্পী সংযোজনের দিক থেকে দ্বিতীয় দল হলো 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান'। এ সময়ে এই দলের পরিচালক ছিলেন অমলেন্দু বিশ্বাস। নারীশিল্পী জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও জয়শ্রী প্রামাণিক ছাড়াও এই দলে পুরুষশিল্পী হিসেবে ছিলেন তুষার দাশগুপ্ত, ঠাকুরদাস ঘোষ, কালী দত্ত, ফণীভূষণ, অমিয় সরকার প্রমুখ।

১৯৭০ সালে গীতশ্রী অপেরায় নায়িকা হিসেবে জনপ্রিয় হন রীনারানী নামের এক অভিনেত্রী। এই রীনারানীই পরবর্তীকালের জনপ্রিয় যাত্রানায়িকা শর্বরী দাশগুপ্ত। ১৯৭৪ সালে স্বামী তুষার দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'তুষার অপেরা'র মাধ্যমে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি লাভ করেন। জ্যোৎস্না বিশ্বাস যাত্রাজগতের জীবিত কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন।

অভিনয়ে নারী

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য নারী যাত্রাশিল্পীদের মধ্যে জ্যোৎস্না বিশ্বাস, শর্বরী দাশগুপ্তা, বীণা দাশগুপ্ত, চন্দ্রা ব্যানার্জী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, তপতী ইসলাম, রিক্তা সুলতানা, মঞ্জুশ্রী মুখার্জী, জাহানারা বেগম, বনশ্রী বাকচী, অঞ্জলি দেবী, মীরা চক্রবর্তী, শান্তিলতা দত্ত, স্বপ্না কুমারী, গায়ত্রী অধিকারী, নমিতা মুখার্জি, সবিতা মুখার্জী, বীনাপাণি দাস, কণিকা পাল, সুমিতা বেগম, শিরিন বানু, রেখা সিদ্দিকী, সান্ত্বনা কুণ্ডু, বিমলা ঘোষ, গীতা ঘোষ, হেমাঙ্গিনী রায়, মমতা সরকার, সবিতা সেন, অনিতা হালদার, ঊষা মৃধা, মায়া ঘোষ, নমিতা মল্লিক, বিজলী চক্রবর্তী, আরতী দাস, শিবানী বক্সী, শেফালী রায়, মিনা বিশ্বাস, আল্পনা হালদার, শেফালী গায়েন, ভক্তিরানী বালা, শামীমা রহমান শামু, ছবি সেন, সাহিদা গাজী, শাহনাজ বেগম, হাসনা বেগম লিপি, রোকেয়া বেগম, মনোয়ারা বেগম, পুতুল বেগম, মনোয়ারা হোসেন, আলেয়া আক্তার, মুক্তিরানী চক্রবর্তী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।

নারীদের মঞ্চে আগমনের আগে নারীচরিত্রে রূপদানকারী যে সকল পুরুষ-অভিনেত্রী এদেশে ছিলেন তাঁদের 'রানী' বলা হতো। সেই রানীদের মধ্যে রেবতীরানী, হরিপদ বায়েন, নিতাইরানী, সুদর্শনরানী, সুধীররানী, ছবিরানী প্রমুখের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

নারী যখন অধিকারী

যাত্রাদলের অধিকারীদের মধ্যে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও রয়েছেন। ২১৫টি যাত্রাদলের অধিকারীর মধ্যে নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হার ১৬ ঃ ১৯৯, শতকরা হারে যা দাঁড়ায় ৭ ঃ ৯৩। যাত্রাশিল্প একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা বলে মালিকানায় নারী অংশগ্রহণ খুব বেশি দেখা যায় নি। ভ্রাম্যমাণ একটি যাত্রাদল পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টকর বলেও নারীদের অনাগ্রহ থাকতে পারে। তবে পেশার ঝুঁকি কম হলে, কিংবা অনুমতি-প্রাপ্তির জটিলতা, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি সমস্যার অবসান হলে নারীর মালিকানা এ শিল্পে বৃদ্ধি পেতে পারে। নগর সংস্কৃতির থিয়েটারে নারীনেতৃত্ব যেখানে হাতেগোনা, সেখানে গ্রামীণ সংস্কৃতির যাত্রাপালায় নারীনেতৃত্ব নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

নারী অধিকারীদের তালিকা

ক্রম	যাত্রাদল	প্রতিষ্ঠা	অধিকারী	জেলা
১.	লেডি কোম্পানি	১৯১৫	শ্রীমতী বোঁচা	ঝালকাঠী
২.	১ নং দীপালি অপেরা	১৯৭৩	বনশ্রী বাকচী	গোপালগঞ্জ
৩.	তুষার অপেরা	১৯৭৪	তুষার দাশগুপ্ত, পরে শর্বরী দাশগুপ্তা	যশোর
৪.	চারণিক নাট্যগোষ্ঠী	১৯৭৪	তাপস সরকার, পরে অমলেন্দু বিশ্বাস, পরে জ্যোৎস্না বিশ্বাস	মানিকগঞ্জ
৫.	কোহিনুর অপেরা	১৯৭৬	আয়েশা আখতার	মানিকগঞ্জ
৬.	আরতি অপেরা	১৯৭৮	আরতিরানী বিশ্বাস	খুলনা
৭.	রুপালী অপেরা	১৯৭৯	সানু আক্তার	কুমিল্লা
৮.	ভাগ্যলিপি অপেরা	১৯৮২	মমতাজ বেগম মায়া	নোয়াখালী
৯.	চাঁদনী অপেরা	১৯৮৪	বীণা বেগম	কুমিল্লা
১০.	নিউ জয়ন্তী অপেরা	১৯৮৬	সাকেলা বেগম	মানিকগঞ্জ
১১.	সুমি নাট্যসংস্থা-২	১৯৮৭	আয়েশা আক্তার	নরসিংদী
১২.	নিউ প্রতিমা অপেরা	১৯৮৭	শিপ্রা সরকার উমা ও সুশীল সরকার	মানিকগঞ্জ
১৩.	নাট্যমঞ্জরী যাত্রা ইউনিট	১৯৮৯	মিনতি বসু ও সুকল্যাণ বসু	সাতক্ষীরা
১৪.	রামকৃষ্ণ যাত্রা ইউনিট	১৯৯১	কৃষ্ণারানী চক্রবর্তী	বাগেরহাট
১৫.	আদি বঙ্গশ্রী অপেরা	১৯৯২	পারভীন জামান	ফরিদপুর
১৬.	তাজমহল অপেরা	১৯৯৭	নার্গিস আক্তার লিপি	শরিয়তপুর

সারণিতে উল্লিখিতদের কেউ কেউ স্বামীর মৃত্যুর পরে দলের হাল ধরেছেন, কেউ স্বামীর সঙ্গে যৌথ মালিকানা গ্রহণ করেছেন, আবার কেউ একক যোগ্যতায়ও যাত্রাদলের অধিকারী হয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, কোনো কোনো দলের রেজিস্ট্রেশন হয়ত পুরুষের নামে, কিন্তু অধিকারী হিসেবে কার্যকর ভূমিকায় রয়েছেন একজন নারী। সেক্ষেত্রে আমরা নারীকেই মালিক হিসেবে গণ্য করেছি।

প্রত্যেক পালায় তিন বা চারজন নারীশিল্পী থাকেন। এছাড়া নৃত্যশিল্পী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় পুরোপুরি। কোনো কোনো দলে দু-একজন পুরুষ নৃত্যশিল্পী থাকেন। তবে বেশকারী বা সাজসজ্জার কাজে নারীর অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। পুরুষরাই এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তবে যাত্রাদলের রেওয়াজ অনুযায়ী শিল্পীরা নিজের মেক-আপ নিজেই গ্রহণ করেন। বেশকারী কেবল সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখেন কিংবা প্রয়োজনের সময় এগিয়ে দেন। রান্নার কাজে নারীর দক্ষতা প্রমাণিত হলেও যাত্রাদলে এই কাজে নারীর তেমন অংশগ্রহণ নেই। পুরুষরাই রান্নার কাজ করে থাকেন। তাঁদের রান্নার ঠাকুর বলা হয়। যন্ত্রসংগীতে কিংবা বিবেক চরিত্রেও নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ে না।

দলের নামে নারীবাচক শব্দ

বাংলাদেশে ২১৫টি যাত্রাদলের নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীবাচক শব্দের প্রাধান্য দেখা গেছে। অধিকারীরা তাঁদের মা, স্ত্রী কিংবা কন্যার নামে দলের নাম রাখতেন। এই সকল দলের জনপ্রিয়তার কারণে নতুন কোনো দল গঠনের সময়েও নামকরণের ক্ষেত্রে আগের নামের অনুকরণ করা হয়। কখনো প্রতিষ্ঠিত দলের নামের আগে ১ নং, আদি, নব, দি, নিউ প্রভৃতি শব্দ জুড়ে নতুন দলের নাম রাখা হয়। নারীবাচক শব্দের কয়েকটি দলের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন, লেডি কোম্পানি, পাষাণময়ী অপেরা, অন্নপূর্ণা যাত্রা পার্টি, জয়দুর্গা অপেরা, বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান, ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা, রাজলক্ষ্মী অপেরা, গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট, নিউ বাসন্তী

অপেরা, দীপালি অপেরা, জয়শ্রী অপেরা, কোহিনুর অপেরা, রূপশ্রী অপেরা, শিরিন যাত্রা ইউনিট, জোনাকী অপেরা, আদি মিতালী অপেরা, বিজয়লক্ষ্মী অপেরা, বিশ্বরূপা অপেরা, বাণীশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান, বঙ্গশ্রী অপেরা, গীতাঞ্জলি অপেরা, জ্যোৎস্না অপেরা, বৈকালী অপেরা, আনন্দময়ী অপেরা পার্টি, বঙ্গলক্ষ্মী অপেরা, সাধনা অপেরা, আরতি অপেরা, দি গীতাঞ্জলি অপেরা, রূপালী যাত্রা পার্টি, চলন্তিকা নাট্যসংস্থা, রূপাঞ্জলি নাট্যসংস্থা, ভাগ্যলিপি অপেরা প্রভৃতি।

যাত্রাপালায় নারী

চারণকবি মুকুন্দদাস এসে যাত্রাকে মাতৃবন্দনা তথা দেশবন্দনার উপায় হিসেবে বিবেচনা করলেন। 'মাতৃপূজা' তাঁর বিখ্যাত পালা।

যাত্রার মূল অবলম্বন তাঁর পালা। কৃষ্ণযাত্রার যুগে রাধার প্রেমলীলাই ছিল মূল আকর্ষণ। রামযাত্রায় সীতা এসেছে সতী নারীর প্রতিকৃতি হিসেবে। কিন্তু রামায়ণের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রধানত 'রামায়ণ' থেকে সীতা-রামকাহিনি এবং 'মহাভারত' থেকে রাধা-কৃষ্ণকাহিনি নিয়ে আবর্তিত হতো সে কালের যাত্রাপালা। এ ধরনের পৌরাণিক বা ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক পালায় হিন্দুধর্মীয় দেবদেবীর আখ্যান ও লীলা বর্ণিত হয়।

শুরুতে কেবল কৃষ্ণযাত্রা ছিল যাত্রার একমাত্র পৌরাণিক বিষয়। পরে কৃষ্ণের কালীয়-দমন লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত পালা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় কৃষ্ণযাত্রার পালাই 'কালীয়দমন' পালা নামে পরিচিত হয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর (১৯১০-১৮৮৮) হাতে কৃষ্ণযাত্রা নতুন রূপ পায়। তাঁর 'স্বপ্নবিলাসযাত্রা', 'রাইউন্মাদিনী বা দিব্যোন্মাদ যাত্রা' এবং 'বিচিত্রবিলাস' যাত্রা তৎকালে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কৃষ্ণকমলের পর নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এসে কৃষ্ণযাত্রা তথা পৌরাণিক যাত্রার হাল ধরেন।

গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যুবধ', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' প্রভৃতি যাত্রামঞ্চের জনপ্রিয় পৌরাণিক পালা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৮) যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়েছে। মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র' (১৮৫৭) পালার শৈব্যা চরিত্র ত্যাগের আদর্শের কারণে যাত্রাদর্শকদের কাছে আকর্ষণীয়।

অঘোরনাথ কাব্যতীর্থের (১৮৭২-১৯৪৩) পৌরাণিক যাত্রাপালার নাম 'বিজয় বসন্ত' বা 'সৎমা' (১৯২১), 'মেবার কুমারী' (১৯২৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯২৩), 'রাধাসতী' (১৯২৫), 'নলদময়ন্তী' (১৯২৭)। এ সকল পালায় পৌরাণিক নারীচরিত্রের মহিমা বর্ণনার মাধ্যমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

মন্মথ রায়ের (১৮৯৯-১৯৮৮) 'চাঁদ সওদাগর' (১৯২৭) এবং 'সাবিত্রী' (১৯৩১) নাটক পৌরাণিক পালা হিসেবে যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়ে আসছে। 'চাঁদ সওদাগর' পালায় তিনি দেবী মনসার বিরুদ্ধাচারী মানবিক চরিত্রের চাঁদকে এঁকেছেন। 'কারাগার' পালায় তিনি পৌরাণিক চরিত্রের রূপকে ব্রিটিশবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই পালাটি ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে।

পালাসম্রাট হিসেবে সম্মানিত ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬)-র পৌরাণিক পালার মধ্যে 'দাসীপুত্র' (১৯৫৩), 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ভরত বিদায়' বা 'মহিয়সী কৈকেয়ী' (১৯৬৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক পালায় শুধু পুরাণের কাহিনি বর্ণনা করেই দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয় না। পুরাণের নতুন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় তাঁর কোনো কোনো পালায়। নতুন ব্যাখ্যার মাধ্যমে পুরাণের নবরূপায়ণ করতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; যেমন রামায়ণের কূট চরিত্রের রানী কৈকেয়ী ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'মহীয়সী কৈকেয়ী' বা 'ভরত বিদায়' পালায় মহীয়সী হয়ে উঠেছেন। পুরাণের নতুন ব্যাখ্যায় তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনি যদি চক্রান্ত করে রামকে চৌদ্দ বছর বনবাসে না-পাঠাতেন, তবে অযোধ্যা রাজ্য শাসনের জন্যে রাম এত উপযুক্ত হয়ে উঠতেন না। রামকে রাজা হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৈকেয়ীর অবদানকে পালাকার ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছেন। নিজপুত্র ভরতকে রাজা করে এবং রামকে বনবাসে পাঠানোর বর চেয়ে রানী কৈকেয়ী খলনারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। রামায়ণের এই প্রচলিত ধারণার বিপরীতে তিনি কৈকেয়ীকে এক মহিয়সী মাতৃরূপে সৃষ্টি করলেন। পালাকার দেখালেন যে বিশ্বামিত্রের পরামর্শে কৈকেয়ী যে রামের নির্বাসন প্রার্থনা করেছেন, তা রামকে 'রোদে পুড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে শিলাবৃষ্টি-বজ্রপাত-অগ্নুৎপাতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে একটা লৌহমানবে পরিণত' করে রাজা হওয়ার যোগ্য করে তোলার জন্যে। পালাকারের এই ব্যাখ্যায় 'পুরাণ' হয়ে ওঠে নতুন পাঠের যোগ্য। 'ভরত বিদায়' বা 'মহিয়সী কৈকেয়ী'

পালার কাহিনি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের। তাঁর 'বীর অভিমন্যু', 'উপেক্ষিতা', 'বিল্বমঙ্গল', 'ধর্মের জাট', 'জীবনযজ্ঞ বা রামরাজ্য' প্রভৃতি পালা পৌরাণিক কাহিনিকে ভিত্তি করে রচিত।

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯?) পৌরাণিক পালা হলো 'মহিষাসুর' (১৯৪০), 'দুর্গতিনাশিনী দুর্গা' প্রভৃতি। তাঁর 'মহিষাসুর' পালার কাহিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে নেয়া হয়েছে।

নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর পৌরাণিক পালা (১৯১২-১৯৮২) 'কবির কল্পনা'র (১৯৫২) আখ্যান নেয়া হয়েছে রামায়ণ থেকে। সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করে রাম যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েছেন, তার ভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করেছেন পালাকার। প্রজাকুলের মানরক্ষায় নিজের সতী স্ত্রীকেও তিনি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছেন। এখানে রামের প্রজাহিতৈষণার পরিচয়কে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ থেকে তিনি রচনা করেছেন 'আলোর ডাক' (১৯৫৯) পালা। দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কুফল প্রচার করাই এই পালার উদ্দেশ্য। মহাভারতের আখ্যান থেকে রচিত 'পাণ্ডব বিজয়' (১৯৬২) পালাটিও তাঁর অমূল্য সৃষ্টি। এছাড়া 'সতী বেহুলা', 'দেবী অন্নপূর্ণা', 'এসো মা লক্ষ্মী', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'লবকুশ' প্রভৃতি পালা যাত্রাজগতের গৌরবের ধন।

আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২২-১৯৯২) 'শুম্ভ-নিশুম্ভ' (১৯৫৬) পালার কাহিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান থেকে সংগৃহীত। পূর্ণচন্দ্র দাসের (১৯০৪-১৯৬৪) 'সতীর সাধনা' (১৯৫১); গৌরচন্দ্র ভড়ের (১৯১৮-১৯?) 'সতী অহল্যা'; প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'সারথী, থামাও রথ'; পরিতোষ ব্রহ্মচারীর (১৯৪৩-২০০০) 'বনবাসে রাম' (১৯৯৬), 'মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৯৭) প্রভৃতি পালা এখনো পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রদান করে চলেছে।

শান্তিরঞ্জন দে-র 'সূর্যপুত্র কর্ণ' এবং 'মাতৃপূজা' (১৯৭১) নামের পৌরাণিক পালা নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি-সহ বিভিন্নদলে অভিনীত হয়েছে। এখানেও নারীচরিত্রের গৌরবের কথা প্রচার করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পালায়ও রয়েছে নারীচরিত্রের মহিমান্বিত প্রকাশ। এই ইতিহাস হতে পারে অতীতের কাহিনি কিংবা সমকালের এমন কাহিনি, যা একসময়ে ইতিহাসের উপাদান হতে পারে। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে রচিত পালাকে তাই রাজনৈতিক পালা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে ঐতিহাসিক পালার সার্থক রূপকার। ১৯৪২ সালে তিনি রঞ্জন অপেরার জন্য লেখেন কাল্পনিক পালা 'রাজনন্দিনী'। এই কাল্পনিক পালা থেকে ঐতিহাসিক পালার বিস্তার ঘটে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সুলতানা রিজিয়া', 'আঁধারে মুসাফির', 'কোহিনূর', 'চাঁদবিবি', কানাইলাল শীলের 'চাষার মেয়ে', 'ধাত্রীপান্না' প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালায় নারীর বীরত্বের কথা প্রকাশ করেছেন।

লোকনাট্য যাত্রাদলে উৎপল দত্ত রচিত 'সন্ন্যাসীর তরবারি' (১৯৭২) ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' এবং উৎপল দত্তের 'সন্ন্যাসীর তরবারি'-র কাহিনির উৎস একই। সন্ন্যাস বিদ্রোহের নেপথ্য নেতা ফকির মজনু শাহের কাহিনি নিয়ে এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী যাত্রাপালা। এই কাহিনি 'ফকির বিদ্রোহী মজনু শাহ' নামেও বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়।

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেহেরুন্নিসা', 'বেগম আসমান তারা', 'তাজমহল', 'নাচমহল', 'বিবি আনন্দময়ী', 'দেবী সুলতানা' পালা বাংলাদেশের মঞ্চে সমান জনপ্রিয়। নামেই বোঝা যায় যে, নারী এখানে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত।

জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'লালবাঈ', 'মুঘল-এ-আযম', 'বাগদত্তা', 'আমি সিরাজের বেগম' পালায় নারীর বীরত্বের গাথা বর্ণিত। 'বাগদত্তা' পালার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পালাকার জানিয়েছেন— 'নিষ্ঠুর সমাজের হাতে লাঞ্ছিতা এক নিরপরাধ নারীকে কেন্দ্র করে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার যে বিরোধ গড়ে উঠেছিল, 'বাগদত্তা' নাটকটি তারই মর্মস্পর্শী আলেখ্য!'

কাল্পনিক ও লোককাহিনিভিত্তিক পালায় নারীচরিত্র এসেছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। আমাদের সমৃদ্ধ লোককাহিনি থেকে, বিশেষ করে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে কাহিনি নিয়ে রচিত পালা যাত্রামঞ্চে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'মহুয়া', 'সোনাই দিঘি', 'মলুয়া', 'ভাগ্যের বলি' এই ধারার উল্লেখযোগ্য পালা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোককাহিনি নিয়ে রচিত পালা ঝুমুর যাত্রাদলে অভিনীত হয়। বরিশালের

লোককাহিনি থেকে 'গুনাইবিবি' ও 'আসমান সিংহ'; খুলনার লোককাহিনি নিয়ে রচিত 'মানিকযাত্রা' ছাড়াও 'ভাসানযাত্রা', 'জামালযাত্রা' প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়। আর 'রূপবানযাত্রা' ষাটের দশকের বাংলাদেশে ছিল সর্বাধিক জনপ্রিয় যাত্রাপালা। শুধু 'রূপবানযাত্রা' পরিবেশনের জন্যে দেশে বেশ কয়েকটি দল গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে আঞ্চলিক লোককাহিনি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁদের অগ্রসারির একজন। তিনি 'মধুমালা' লিখেছেন, 'আসমানসিংহের ফাঁসি', 'মোনাইযাত্রা' অবলম্বনে লিখেছেন 'পদ্মাপার'। এগুলোকে তিনি লোকনাট্য বললেও 'মঞ্চরীতি, গীতিধর্মিতা ও সংলাপের ধরনে এগুলো আমাদের যাত্রামঞ্চে সমান গুরুত্বে অভিনীত হয়ে চলছে'।

নড়াইলে হাড়িয়ার ঘোপ গ্রামের বিশিষ্ট কবিয়াল রসময় সরকার 'জ্যোছনার সংসার' নামে একটি কাল্পনিক পালা রচনা করেছেন। এতে ঐতিহাসিক চরিত্রের মাধ্যমে চলমান সমাজের রূপক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে। চারুচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'মধুমালা'; রফিকুল ইসলাম রানার 'রাজার ছেলে ভিখারী', 'সুজন মালা', 'কলঙ্কিনী মালা', 'মা কেন কাঁদে'; হীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসের 'লাইলী মজনু'; মাস্টার সেকেন্দার আলীর 'বেদ-কন্যা', 'আসমান সিংহের ফাঁসী' প্রভৃতি পালা গীতিধর্মী যাত্রাদলে অভিনীত হয়। ভুল বাক্য, অযৌক্তিক কাহিনিবিন্যাস সত্ত্বেও এ সকল পালা মঞ্চস্থ হয়ে চলছে। লোককাহিনির ওপর ভিত্তি করেই এ সকল পালা রচিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন নামে প্রকাশিত 'গুনাইবিবি', 'রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা', 'আলোমতি ও প্রেমকুমার', 'অরুণ শান্তি', 'ভিখারীর ছেলে সুজন', 'সাগর ভাসা', 'আপন দুলাল', 'কাজল রেখা', গহর বাদশা বানেছাপরী', 'ছয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' পালাও ঝুমুর দলের প্রিয় পালা। মানসম্পন্ন দেশীয় পালা না-থাকায় আমাদের যাত্রামঞ্চে এ সকল রচনাই এখন গীতাত্মক যাত্রাদলগুলোর মূল অবলম্বন হিসেবে গুরুত্ব পেয়ে চলেছে।

সামাজিক পালায় চলমান সমাজের ন্যায়-অন্যায়, সংগতি-অসংগতি, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি বিষয়। সামাজিক পালারচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রঞ্জন দেবনাথ। তাঁর 'গলি থেকে রাজপথ', 'নীচুতলার মানুষ', 'এরই নাম সংসার', 'পৃথিবী আমারে চায়', 'আজকের সমাজ', 'বধূ এলো ঘরে', 'সংসার কেন ভাঙে', 'আমরাও মানুষ', 'শশীবাবুর সংসার', 'একটি গোলাপের মৃত্যু', 'স্বামী সংসার সন্তান', 'বন্দী বিধাতা', 'বিদূষী ভার্যা বা মেঘে ঢাকা তারা', 'কন্যাদায়', 'প্রিয়ার চোখে জল', 'সন্ধ্যা প্রদীপ শিখা', 'যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ', 'কলঙ্কিনী বধূ বা জীবন নদীর তীরে', 'মায়ের চোখে জল', 'অনুসন্ধান', 'জেল থেকে বলছি', 'সংসার আদালত', 'বিবেকের চাবুক', 'এ পৃথিবী টাকার গোলাম', 'জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার', 'সাত পাকে বাঁধা', 'নন্দরানীর সংসার', 'চরিত্রহীন', 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ', 'মায়ের চোখে জল' প্রভৃতি পালা খুবই মঞ্চসফল।

সামাজিক পালায় ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও উল্লেখ করার মতো। তাঁর 'একটি ফুলের মৃত্যু', 'কান্না-ঘাম-রক্ত'. 'ময়লা কাগজ', 'অভাগীর সংসার', 'অচল পয়সা', 'মা মাটি মানুষ', নিহত গোলাপ', 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী', 'বাঁচতে চাই', 'অশ্রু দিয়ে লেখা', প্রভৃতি পালা সকল শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার কাছেই জনপ্রিয়।

নির্মল মুখোপাধ্যায়ের 'সোনাডাঙ্গার বউ', 'প্রেমের সমাধি তীরে', 'পথের ছেলে', 'জীবন থেকে নেয়া', 'আজকের বাঙালি', 'মমতাময়ী মা', 'গরিব কেন মরে', 'জুয়াড়ি', 'মা যদি মন্দ হয়', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'অমানুষ', 'কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী', 'মানবী দেবী' প্রভৃতি পালা যাত্রামোদী মানুষের কাছে অতি প্রিয়।

কমলেশ ব্যানার্জীর 'বাঈজীর মেয়ে', 'হাসির হাটে কান্না', 'জবাব দাও', 'আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও', 'কূল ভাঙা ঢেউ', 'বিশ্বাসঘাতক', 'হারানো সুর', 'সমাজ' পালা পেশাদার-অপেশাদার সকল দলেই অভিনীত হয়।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'পৃথিবীর পাঠশালা', 'মানুষ পেলাম না', 'একফোঁটা অশ্রু', 'পেটের জ্বালা'; চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর 'হকার', 'সিঁদুর পরিয়ে দাও', 'গফুর ডাকাত', 'নয়নতারা', 'প্রতিমা'; নন্দগোপাল রায় চৌধুরীর 'জনতার রায়'; মহাদেব হালদারের 'সন্তান হারা মা', 'লক্ষ টাকার লক্ষ্মী', 'স্বামী ভিক্ষা দাও'; রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগুন', 'অমানুষ', 'লাল সেলাম'; শম্ভুনাথ বাগের 'পৃথিবী তোমায় সেলাম', 'অসুস্থ পৃথিবী'; কানাইলাল নাথের 'গাঁয়ের মেয়ে', 'আমি মা হতে চাই', 'মা ও ছেলে'; সত্যপ্রকাশ দত্তের 'বধূ কেন কাঁদে', 'দুই টুকরো বৌমা'; জিতেন্দ্রনাথ বসাকের 'মানুষ', 'জীবন জিজ্ঞাসা', 'সোনার হরিণ', 'জানোয়ার'; স্বদেশ হালদারের 'ঝাড়ুদার', 'ঘুমন্ত সমাজ', 'আজকের দুনিয়া'; বলদেব মাইতির 'অভিশপ্ত প্রেম', 'কাজল দিঘির কান্না'; অনিল দাসের 'সোনার সংসার'; শিবাজী রায়ের 'সিঁদুর পেলাম না'; সঞ্জীবন দাসের 'শূন্য বাসরে বধূ', 'হতভাগিনী মা'

এবং স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্মশানে হলো ফুলশয্যা', 'অচল পয়সা', 'অভাগীর কান্না' দুই বাংলার মঞ্চে সমানভাবে আদৃত হয়েছে।

পূর্ণেন্দু রায়ের 'দস্যুরানী ফুলনদেবী', 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'দুটি পয়সা', 'ফুলশয্যার রাতে' প্রভৃতি পালা বিভিন্ন যাত্রাদলে অভিনীত হয়ে আসছে। 'দস্যুরানী ফুলনদেবী' পালাটি সামাজিক পালা হলেও এতে ভারতে 'দস্যুরানী' হিসেবে আলোচিত ও পরবর্তী সময়ে লোকসভার সদস্য ফুলনদেবীর জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত। বাংলাদেশের পরিতোষ ব্রহ্মচারীও এই কাহিনি নিয়ে যাত্রাপালা রচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের অজিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের শাহজাহান বিশ্বাস একই কাহিনি নিয়ে একই নামে পালা রচনা করেন। পরিতোষ ব্রহ্মচারীর 'এক যুবতী হাজার প্রেমিক', 'আবার দরিয়া ডাকে', 'বেদের মেয়ে জ্যোছনা', 'ডিসকো কুইন', 'ছোটমা' ও 'বিরাজবৌ' (শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে), 'রিক্তের বেদন' (কৃষ্ণগোপাল বসাকের উপন্যাস অবলম্বনে) ও 'বর্ণমালা মা আমার' সামাজিক পালা হিসেবে তুষার অপেরা-সহ প্রথম শ্রেণির পেশাদার বিভিন্ন যাত্রাদলে অভিনীত হয়।

বাংলাদেশের পালাকার মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'বাসনার সমাধি'; সাধনকুমার মুখার্জীর 'চণ্ডালের মেয়ে', 'পৃথিবীর আত্মহত্যা'; অরুণ দাসের 'জারজ সন্তান'; ননী চক্রবর্তীর 'প্রণয় পিপাসা', 'কলিকালের মেয়ে', 'যৌতুক' প্রভৃতি দেশীয় পটভূমিতে রচিত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা, যেখানে নারীকে প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখানো হয়েছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি যে, জীবনী-পালায় নারীজীবনী তেমন উঠে আসে নি। আধুনিক যাত্রামঞ্চে সফল জীবনীপালা রচিত হয় ব্রজেন্দ্রকুমারের হাতেই। ১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনকাহিনি নিয়ে তিনি নট্ট কোম্পানির জন্যে রচনা করেন 'মায়ের ডাক' পালা। এখানে সুভাষ বসুর মা-এর রূপকে ব্যাপক অর্থে দেশজননীর কথাই বলা হয়েছে। সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'অনাথ জননী' পালায় মাদার তেরেসার জীবনকাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আর কোনো মহীয়সী নারীর জীবনী নিয়ে যাত্রাপালা রচিত হয় নি। জীবনী-পালার মধ্যে রয়েল বীণা কোম্পানির 'নটী বিনোদিনী' পালায় বিনোদিনীর চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে।

বাংলাদেশের যাত্রাজগতে নারী পালাকারের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। অভিনেত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস ১৯৯৬ সালে 'রক্তস্নাত একাত্তর' নামে একটি যাত্রাপালা রচনা করেছেন। এছাড়া নারীরচিত আর কোনো যাত্রাপালার খবর এই প্রাবন্ধিকের জানা নেই।

যাত্রাগানে অশ্লীলতা ও অপবাদ

যাত্রাদলে নারীর অংশগ্রহণ ও উপস্থাপনা গৌরবজনক হলেও যাত্রার অপবাদের কারণ যে অশ্লীলতা, তার জন্য নারীকে অর্থাৎ নৃত্যশিল্পীকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু আমরা ভালো করেই জানি যে, একজন নৃত্যশিল্পী ইচ্ছেমতো নাচেন না। দলের অধিকারী কিংবা আয়োজক নায়েকের নির্দেশনা পেয়েই তিনি নৃত্য পরিবেশন করেন। কাজেই অশ্লীল নৃত্য পরিবেশন করলেও তিনি এর জন্য দায়ী হবেন না। তাঁকে তো নাচানো হচ্ছে। এটি তাঁর জীবিকা। দর্শক-শ্রোতাকে আকর্ষণ করার জন্য নাচে অশ্লীলতা প্রয়োগ করা হচ্ছে। যাত্রাদলে অশ্লীল নাচের উপযোগী শিল্পী না-পাওয়া গেলে বাইরে থেকে 'প্রিন্সেস' ভাড়া করে এনে নাচানো হয়। এক্ষেত্রে যাত্রাদলের মালিকদের চেয়ে আয়োজকদেরই দায় বেশি। কিন্তু সমাজ আঙুল তুলে থাকে নিরুপায় নারীশিল্পীটির ওপর।

যাত্রাগানে নারীর ভূমিকা সকল সময়েই গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু এখন দেশে যাত্রাগানের অনুমতি পাওয়াই দুষ্কর। লাইসেন্স থাকার পরেও প্রতিরাতের জন্য আলাদা অনুমতি নিতে হয় পুলিশের কাছ থেকে। 'ভদ্রলোকেরা' এখন যাত্রার আয়োজন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। সেখানে সামনে আসছে শহর ও শহরতলীর ষণ্ডারা। তারা যাত্রাগানে অভিনয়ের চেয়ে অভিনয়-বহির্ভূত নাচগানের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট। তারা যাত্রাদল ভাড়া করে বসিয়ে রেখে রাজধানী থেকে আলাদা করে প্রিন্সেস ভাড়া করে নিয়ে যায়। অনুমতি নেয়া হয় যাত্রাগানের জন্য কিন্তু রাতভর দেখানো হয় প্রিন্সেসদের উদ্দাম নৃত্য। আর দোষ দেয়া হয় যাত্রাদলের নারীদের। আয়োজকরা তাদের নাচতে বাধ্য করে। এতেও না-পোষালে বাইরে থেকে পেশাদার নাচুনে কিংবা চলচ্চিত্রের এক্সট্রাদের ভাড়া করে নিয়ে যায় তারা। কাজেই যাত্রাগানে অশ্লীল নৃত্যের জন্য দায়ী যাত্রামালিক কিংবা শিল্পীরা নয়, এজন্য সম্পূর্ণ দায়ী আয়োজকরা।

যাত্রাগানে অশ্লীলতা শুরু হয় সত্তর দশকের শেষের দিকে। জিয়াউর রহমানের আমলে যখন সারা দেশে প্রদর্শনী মেলা শুরু হয়, তখন যাত্রাগানের ব্যাপক আয়োজন হতে থাকে। তখন যাত্রা চলে যায় প্রকৃত যাত্রা-আয়োজকদের হাত থেকে থানা প্রদর্শনী-আয়োজকদের হাতে। বিনোদনের চেয়ে তারা বাণিজ্যকে বড়ো করে দেখার জন্য চালু করে অশ্লীল নৃত্য। যাত্রামঞ্চে নাচার জন্য আলাদা নৃত্যশিল্পীগোষ্ঠী তৈরি হয়। এদেরকে প্রিন্সেস বলা হতো। '৫৫৫ রত্না' নামের এক প্রিন্সেস তখন বেশ আলোড়ন তুলেছিল। এরকম অসংখ্যা প্রিন্সেস তখন যাত্রাশিল্পী না-হয়েও যাত্রাদলে রাতচুক্তিতে নাচার ধারা চালু করে। এখনো এই ধারা চলছে। ঢাকা শহরে প্রায় ৫০০ প্রিন্সেস আছে, যারা সিনেমার এক্সট্রা, ভ্যারাইটি শো, পুতুল নাচ, সার্কাস এবং যাত্রাগানে প্রিন্সেস হিসেবে অশ্লীল নৃত্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

যাত্রাদলে একসময় নায়ক-নায়িকার নাম শুনে বায়না করা হতো। এখন সুন্দরী নৃত্যশিল্পী ক'জন আছে, তাই দেখে দল ঠিক করা হয়। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে যাত্রাসম্রাজ্ঞী নামে খ্যাত জ্যোৎস্না বিশ্বাস আক্ষেপ করে বলেছেন, 'আয়োজকরা বায়না-করা যাত্রাশিল্পীদের সাথে এক সপ্তাহের নিকাহ করা বউয়ের মতো আচরণ করতে চায়'। অর্থাৎ তাদের ইচ্ছেমতো নাচাবে, গাওয়াবে এবং অভিনয় করাবে। এখানে শিল্পীদের মতামতের মূল্য একেবারেই নেই।

বর্তমানে যাত্রাগানে অশ্লীলতার অভিযোগ বহাল থাকায় এতে নারীদর্শকদের উপস্থিতি কমে গেছে। শহর ও শহরতলীর যাত্রামঞ্চে কোনো নারীদর্শক থাকে না। নিরাপত্তার অভাবেই তারা এখানে আসা সমীচীন মনে করে না। তবে প্রত্যন্ত গ্রামের যাত্রামঞ্চে এখনো দর্শকদের প্রায় অর্ধেক থাকে নারী। গ্রামের যাত্রামঞ্চে অশ্লীল নৃত্য পরিবেশনের ব্যাপারে আয়োজকরাই নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখে। অভিনয় দেখেই তারা মুগ্ধ হতে চায়।

উপসংহার

এ বছর যাত্রাগানের এখনো অনুমতি পাওয়া যায় নি। সার্ক সম্মেলনের আগে যাত্রার অনুমতি দেয়া বন্ধ ছিল। কিন্তু একাধিকবার পিছিয়ে সেই সম্মেলন হলেও যাত্রার অনুমতি দেয়ার প্রথা শিথিল করা হয় নি। সারা দেশে বোমা হামলার ভয়ে পুলিশ যাত্রাপালার অনুমতি দেয়া বন্ধ করেছিল, যা এখনো বহাল রয়ে গেছে। নারী-পুরুষ সম্মিলিত এই গ্রামীণ বিনোদন মাধ্যমকে ব্যবহার করে অন্যান্য দেশ যখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রচারণা চালায়, সেখানে আমাদের দেশে মৌলবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল আপত্তির কারণে যাত্রাগান কার্যত বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

'ইসলাম সমর্থন করে না' এমন অভিযোগে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান 'রূপবান' যাত্রা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কবি জসীমউদ্‌দীন (৮ মার্চ ১৯৫৬) লিখেছিলেন, 'হয়তো দায়িত্বহীন লোকের ভুল সংবাদে তিনি এই গানকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তিনি তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিবেন, এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই'। পরবর্তী সময়ে আদালতে মামলার ফলে 'রূপবান যাত্রা' তথা যাত্রাশিল্পের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সরকার বাধ্য হয়। এই 'রূপবান' পালায় ১২ দিনের শিশু রহিম বাদশার সঙ্গে ষোড়শী রূপবানের বিয়ের রূপক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এটি সারাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় যাত্রাপালা। পরাধীন বাংলাদেশে যাত্রার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছিল, আর আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে মোনায়েম খানের 'উত্তরসূরী'রা তা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র করে চলেছে। যাত্রার ওপর আঘাতের অন্যতম কারণ এতে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ রয়েছে। আর দ্বিতীয় কারণ যাত্রাগান সকল সময়েই অসাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রকাশ ঘটায়। যারা নারীর অগ্রযাত্রার বিরোধী, যারা অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের বিরোধী, তারাই অশ্লীলতার অভিযোগ তুলে যাত্রাশিল্পকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা করছে।

যাত্রার অশ্লীলতা দূর করতে গিয়ে যাত্রাশিল্পকেই উঠিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। চলচ্চিত্রের অশ্লীলতা রোধ করতে নির্দিষ্ট চলচ্চিত্রটার সেন্সর বাতিল এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া চালু আছে। যাত্রার ক্ষেত্রেও তেমন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই যাত্রা বন্ধ করে নয়। তাছাড়া এর যুগোপযোগী সংস্কার করা যেতে পারে। আবার নারী-পুরুষ একসঙ্গে বসে যাত্রা উপভোগ করতে পারবে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

তপন বাগচী উপপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। drbagchipoetry@gmail.com